নোবেলজয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রাসঙ্গিক অর্থনীতি

বিশ্বে মোট জনসংখ্যার তুলনায় প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদের সংখ্যা নগণ্য। অথচ, প্রতিটি মানুষকেই এমনকী, হতদরিদ্র হলেও, নিত্য কিছু কিছু অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ধরা যাক, দরিদ্র শিশুদের বিনামূল্যে জরুরি প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার একটি ভ্রাম্যমান গাড়ি এলাকায় উপস্থিত হয়েছে। প্রত্যাশা, গরিব মায়েরা তাঁদের শিশুদের নিয়ে টিকা দেওয়াতে আসবেন। আরও ধরা যাক, কোনও প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদের পরামর্শক্রমে সেই শিবিরে শিশুকে টিকা দেওয়ার পাশাপাশি শিশুর মায়ের হাতে এক কেজি ডাল বিনামূল্যে প্রদান করা হবে। অর্থনীতিতে শিক্ষাগত কোনও প্রশিক্ষণ নেই এমন একজন মানুষকে প্রশ্ন করা হল, "এই কৌশলের ফলে কি শিবিরে শিশুদের উপস্থিতি বাড়বে?"
সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি যে, জবাব হবে, "হ্যাঁ।"

এবার বিষয়টা আরও খতিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। টিকার সঙ্গে ডাল বিলির ব্যবস্থা থাকলে যদি বেশি সংখ্যক মা শিশুদের টিকা দেওয়াতে আনেন তাহলে, শিশুর মায়ের কাছে শিশুর স্বাস্থ্যের চিন্তা বা সচেতনতার তুলনায় পারিবারিক অর্থনৈতিক চিন্তা গুরুতর। এটি প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদের সিদ্ধান্ত এবং অর্থনীতির প্রশিক্ষণহীন মানুষের ধারণার সঙ্গে সিদ্ধান্তটির প্রভেদ নেই। তাহলে, শিশুর মা, অপর এক সাধারণ ব্যক্তি এবং একজন প্রশিক্ষিত অর্থনীতিবিদের চিন্তা দেখা যাচ্ছে অভিন্ন। কেন? কারণ, এই ধারণাটি যতটা অর্থনৈতিক তত্ত্বপ্রসূত ততটাই কাণ্ডজ্ঞান-প্রণোদিত।
যদি তা-ই হয় তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কাণ্ডজ্ঞানের বাস্তবতা বা, সত্য-মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টায় বিপুল ব্যয়ে অর্থনৈতিক সমীক্ষার আয়োজনের প্রয়োজন কী?

অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার দুফ্লো এবং মাইকেল ক্রেমার অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগেও তাঁদের কর্মপদ্ধতি কেন্দ্র করে এই প্রশ্ন এবং আরও বিবিধ প্রশ্ন উঠেছে এবং তাঁরা পুরস্কৃত হওয়ার পর এসব বিষয়ে চর্চা স্বাভাবিক কারণেই বেড়েছে।

নোবেলজয়ী ত্রয়ীর মূল গবেষণা এবং তৎসংক্রান্ত কর্মকাণ্ডগুলির সারসংক্ষেপ বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। এঁদের সমীক্ষা ও গবেষণাপদ্ধতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং চর্চিত রাশিবৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাপদ্ধতিটি র‍্যানডমাইজ্‌ড কন্‌ট্রোল্‌ড ট্রায়াল (আর-সি-টি) নামে পরিচিত। বাংলায়, অক্রম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। এই বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করে কোনও সমস্যার সমাধান বা কোনও বিশেষ নীতির প্রায়োগিক সাফল্য যাচাই করা যেতে পারে। শুরুতেই যে উদাহরণটি দেওয়া হয়েছে তার মাধ্যমে বিষয়টা যথাসম্ভব সহজে বোঝার চেষ্টা করা যাক। ধরা যাক, র‍্যান্‌ডম স্যাম্প্‌লিং অর্থাৎ, অক্রম নমুনা পদ্ধতিতে শিশুদের দুটি নমুনা নির্বাচিত হল। একটি নমুনার শিশুদের টিকার পাশাপাশি তাদের মায়েদের এক কেজি করে ডাল দেওয়া হল। এই শিশুদের দলটি হল এক্সপেরিমেন্টাল গ্রুপ অর্থাৎ, পরীক্ষাধীন দল। দ্বিতীয় নমুনার শিশুদের ক্ষেত্রে তাদের মায়েদের ডাল দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হল না। এই দলটিকে বলা হচ্ছে কন্‌ট্রোল গ্রুপ অর্থাৎ, নিয়ন্ত্রণ দল। এবার দেখা হবে যে, কোন্‌ দলের শিশুরা বেশি সংখ্যায় প্রতিষেধক টিকা গ্রহণ করেছে। যদি দেখা যায় যে, যাদের ডাল দেওয়া হবে সেই শিশুদের দলে টিকাগ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা যাদের ডাল দেওয়া হবে না সেই দলের টিকাগ্রহণকারী শিশুদের সংখ্যার তুলনায় পরিসংখ্যান-মান্য উল্লেখযোগ্যতায় অধিক, তাহলে টিকাকরণের ক্ষেত্রে ডাল বিলি করার কৌশলটি সার্থক বলে গ্রাহ্য হবে।

গবেষণার ক্ষেত্রে আর-সি-টি পদ্ধতির ব্যবহার নতুন কিছু নয়। চিকিৎসাশাস্ত্র এবং ওষুধপত্রের কার্যকরিতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের উল্লেখ অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকেও পাওয়া যায়। বিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে চিকিৎসা ও তৎসংক্রান্ত পণ্যের উপযোগিতা পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। গত শতকের ষাটের দশক থেকে আশির দশকের মধ্যে অর্থনীতির গবেষণার ক্ষেত্রে আর-সি-টি প্রয়োগের কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। নব্বইয়ের দশক থেকে অর্থনীতির একাধিক শাখায় এর নিয়মিত বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। একবিংশ শতকের শুরু থেকেই ডেভেলপমেন্ট ইকনমিক্‌স বা, উন্নয়নমূলক অর্থনীতির গবেষণার ক্ষেত্রে আর-সি-টি পদ্ধতির ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ হতে থাকে। সাম্প্রতিক কালে উন্নয়নমূলক অর্থনীতির গবেষণার উৎকর্ষ বিচারের ক্ষেত্রে আর-সি-টি পদ্ধতির ব্যবহার অনেক গবেষকের কাছে ‘গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড’ অর্থাৎ গবেষণার স্বর্ণমান হিসাবে মান্যতা পাচ্ছে। অর্থাৎ, গবেষণায় আর-সি-টি প্রয়োগ হয়ে থাকলে কাজটিকে উচ্চমানের গণ্য করা হচ্ছে।

অভিজিত, এস্থার ও ক্রেমারের পুরস্কারপ্রাপ্তির প্রসঙ্গে নোবেল কমিটি ঘোষণা করছেন – "এই বছরের নোবেলপ্রাপকদের গবেষণা দারিদ্রের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। কেবলমাত্র দুই দশকে তাঁদের পরীক্ষানির্ভর গবেষণাপদ্ধতি উন্নয়ন অর্থনীতির ভোল বদলে দিয়েছে, উন্নয়ন অর্থনীতি এখন গবেষণার এক সমৃদ্ধিশালী ক্ষেত্র।" লক্ষণীয় দ্বিতীয় বাক্যটির শেষাংশ। অংশটি ইংরেজিতে উদ্ধৃত করলে চমক লাগে – "their new experiment-based approach has transformed development economics, which is now a flourishing field of research." – now a flourishing field of research! মানেটা কী? আগে উন্নয়ন অর্থনীতি সমৃদ্ধ ছিল না? তাহলে, সমির আমিন, হোলিস চেনেরি, আর্ঘিরি ইম্যানুয়েল, মাহ্‌বুব উল হক, জন হ্যারিস, ইরমা অ্যাডেলম্যান, জন ফেই, গুস্তাভ র‍্যানিস, অ্যালবার্ট হার্শম্যান, উইলিয়াম আর্থার লুইস, কার্ট ম্যান্ডেলব্যম, গুনার মির্‌ডাল, মাইকেল টোডারো, ড্যানিয়েল থর্নার, অ্যালিস থর্নার, পল স্ট্রিটিন, হ্যান্‌স সিঙ্গার, রাউল প্রেবিশ, অমর্ত্য সেন, কৌশিক বসু, প্রণব বর্ধন, বারবারা হ্যারিস ... অতীতে এঁরা কী করেছেন!

এখানে সামান্য ইতিহাস আশ্রয় না করলেই নয়। গত শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে একে একে ইওরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের সমাপ্তি ঘটতে পৃথিবীর একটা বড় অংশ চিহ্নিত হল অনুন্নত বলে। সদ্য স্বাধীন দেশগুলির তরফে তাগিদ জন্মাল অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটিয়ে বিশ্বের উন্নত দেশগুলির সমকক্ষ হওয়ার বা, অন্তত কাছাকাছি পৌঁছনোর। ক্রমে বোঝা গেল, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং উন্নয়ন এক বস্তু নয়। অনুন্নত শব্দটির জায়গা নিতে থাকল স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল শব্দগুলি। অর্থনীতির গবেষকদের অনেকেই বুঝলেন এবং বোঝালেন যে, উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলির উন্নতি ও উন্নয়নের ব্যাখ্যা যে তত্ত্বসমূহে পাওয়া যায় সেগুলি স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিস্থিতি তথা সমস্যা ব্যাখ্যা করতে অপারগ। ফলে, সেগুলি এইসব দেশের সমস্যার সমাধানসূত্র নির্দেশ করতেও অক্ষম। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির জন্য তাঁরা মূলস্রোতের অর্থনীতি থেকে ভিন্ন, নতুন তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণের প্রয়াস পেলেন। জন্মাল উন্নয়ন অর্থনীতি। গত শতকের পঞ্চাশ থেকে আশির দশক অবধি যুগপৎ নিবিড় ও বিস্তৃত গবেষণা হয়েছে অর্থনীতির এই শাখায়। অনায়াসে 'ফ্লারিশিং' বলা চলে। একসময় কল্যাণমূলক অর্থনীতির গবেষণা হয়েছে উন্নয়ন অর্থনীতির পাশাপাশি, প্রায় পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে, পরস্পরের পরিপূরক হিসাবে। পঞ্চাশ থেকে আশির দশকে ভারতের মতো অনেক দেশেই দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা,

উৎপাদনের উপাদানের বড় অংশের সরকারি মালিকানা, দ্রব্য ও সেবা উৎপাদনের বহু ক্ষেত্রে সরকারের সক্রিয় ভূমিকা এবং বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি লক্ষ করা গেছে। প্রসঙ্গত, অর্থনীতি বিষয়টির প্রায় জন্মলগ্ন থেকেই চলে আসছে পজিটিভ ইকনমিক্স অর্থাৎ সদর্থক অর্থনীতি বনাম নর্মেটিভ ইকনমিক্স অর্থাৎ, নীতিবাদী অর্থনীতির দ্বন্দ্ব। কল্যাণমূলক অর্থনীতিকে নীতিবাদী অর্থনীতির শাখা বলেই মনে করা হয়। আশির দশকের শুরুতেই কল্যাণমূলক অর্থনীতির ধারায় গবেষণা কমতে থাকে। ইতিমধ্যে, সোভিয়েত রাশিয়া এবং পূর্ব ইওরোপের দেশগুলিতে সমাজতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণা প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। শুরু হয়েছে কম্যুনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। সারা বিশ্বেই গরিষ্ঠসংখ্যক সংবাদপত্র, গবেষণাপত্র, বিভিন্ন সমিতি ও সংগঠনের মুখপত্র ইত্যাদি অর্থনীতিতে সরকারি নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে এবং বেসরকারি উদ্যোগের পক্ষে সরব। বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি আগামীর মন্ত্র হিসাবে সর্বত্র উচ্চারিত। কাজেকাজেই, উন্নয়ন অর্থনীতির খোল-নলচে এবং রং-রূপও বদলাতে শুরু করল। এমনকী, আশি-নব্বইয়ের দশকে এমনটাও ভাবা গিয়েছিল যে, আলাদা করে উন্নয়ন অর্থনীতি বিষয়টার আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কি না। ভাবা গিয়েছিল যে, মূলস্রোতের অর্থনীতির মধ্যেই স্বল্পোন্নত বা, উন্নয়নশীল দেশের সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

বাদ সাধল আশির দশক থেকে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে দ্রুত হারে দারিদ্র, বেকারত্ব, অপুষ্টি, অনাহার ইত্যাদি বেড়ে চলা এবং জরুরি সেবা যেমন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদির প্রয়োজনানুগ কাঠামো ও বিস্তৃত ব্যবস্থা গড়ে না ওঠা। উন্নয়ন অর্থনীতির গবেষণা একবিংশ শতকেও জরুরি সাব্যস্ত হল।

অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও এস্থার দুফ্লো গত প্রায় দেড় দশক ধরে দারিদ্রের বিষয়ে গবেষণা করছেন। ওদিকে, মাইকেল ক্রেমার নব্বইয়ের দশকের মধ্যভাগে আর-সি-টি পদ্ধতি প্রয়োগ করে দারিদ্রের বিষয়ে গবেষণা শুরু করেছেন অর্থাৎ, অভিজিতের আগেই তিনি গবেষণায় আর-সি-টি ব্যবহার করেছেন। তারপর থেকে অভিজিত ও এস্থার যেমন নিজেরা আলাদা গবেষণা করেছেন তেমনই মাঝেমধ্যেই ক্রেমারকে সঙ্গে নিয়ে তিন জনে যৌথ উদ্যোগে কাজও করেছেন। অভিজিত ও এস্থার ভারতে তো বটেই, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করেছেন এবং করে চলেছেন। অভিজিত বহু প্রশ্ন তুলে ধরেছেন যেমন, মরোক্কোতে যে লোকটা খেতে পায় না সে টেলিভিশন কেনে কেন? দরিদ্র এলাকায় শিশুরা স্কুলে গিয়েও কিছু শেখে না কেন? মহারাষ্ট্রের দরিদ্রতম ব্যক্তি

তার আয়ের সাত শতাংশ কেন চিনি কিনতে ব্যয় করে? পরিবারে বেশি সন্তানের আগমন হলে কি সত্যিই দারিদ্র বাড়ে?

অভিজিত বলছেন, আপাতদৃষ্টিতে এইসব বিভ্রান্তিজনক প্রশ্নের উত্তর এবং পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা পেতে গেলে দরিদ্র মানুষকে এবং দারিদ্র বিষয়টা বুঝতে হবে। বলছেন, গরিব মানুষকে গরিবির চলতি ধারণা কিংবা, কোনও পূর্বানুমানের ভিত্তিতে দেখলে চলবে না। গরিব বলতে বিশেষ কতকগুলি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এক মানুষের কল্পনা করতে গেলে ভুল হবে। বিশেষত, গরিবকে ভাল ও মন্দ কিংবা, সদর্থক ও নঞর্থক মানদণ্ডের কোনও-না-কোনও প্রান্তে চরম মানে মূল্যায়ন করতে চাওয়া ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি। গরিব মানেই তারা হয় হদ্দ কুঁড়ে কিংবা প্রবল পরিশ্রমী ভাবাটা ভুল। তেমনই ভাবা ভুল যে, হয় তারা ভীষণ উৎসাহী উচ্চাকাঙ্ক্ষী আর নয় তো, নিস্পৃহ আকাঙ্ক্ষাহীন। বিনায়ক ও তাঁর সহযোগী গবেষকেরা বলছেন, আর পাঁচটা মানুষেরই মতো গরিবেরও আকাঙ্ক্ষা, সাধ, মনোবাঞ্ছা, হিংসা, লোভ সবই আছে। কিন্তু, সে গরিব। সাধ থাকলেও, ইচ্ছাপূরণের সামর্থ্য নেই। বিষয়টা আমরা এভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি – এমন হতেই পারে, হাতে কিছু টাকা এলে বা, আয় সামান্য বাড়লে, সে পরিবারের জন্য আরও সবজি বা, ছেলের জন্য পড়ার বই-খাতা না কিনে অল্প মাংস কিংবা, একটা সস্তার মোবাইল ফোন কিনে ফেলল (সেই প্রাচীন গিফেন গুড তত্ত্বের কথা মনে পড়ে যায়)। এই মানুষকে রেশনে চাল দিয়ে কিংবা, তার সন্তানকে স্কুলে মিড-ডে মিল দিয়ে কী উপকার হবে! দু'টাকার চাল বাজারে সামান্য বেশি দামে বেচে, নিজে আধপেটা খেয়েও, সে চাল বেচা টাকায় গোটা কয় সিঙ্গারা কিংবা, এক প্লেট চাউমিন কিনে ফেলতে পারে। পেট ভরল না ঠিকই, কিন্তু জিভ সিঙ্গারার কিংবা, চাউমিনের স্বাদটুকু তো পেল। ভেবে দেখা যেতে পারে আমরা মধ্যবিত্তরা ঠিক কতটা 'র‍্যাশনাল' বা, বিচক্ষণ। সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয় কি আমরা প্রায়শ করি না? অপব্যয়ও তো করে থাকি। অমিতব্যয়ী মধ্য কিংবা উচ্চবিত্তের পথের ভিখিরি হয়ে যাওয়ার উদাহরণ কি কম আছে! তাহলে, গরিবের মিতব্যয়িতা ও শুদ্ধ সিদ্ধান্ত কেন আমাদের প্রত্যাশিত? দারিদ্ররেখার অনেকটা উপরে বসে পা-দোলানো লোকেদের এ এক ভণ্ডামি কিংবা, বোধের কিংবা, চেতনার সমস্যা। এই পা-দোলানো লোকগুলোই তো দারিদ্র দূরীকরণের নীতি প্রণয়ন করে থাকে। তাহলে, সজ্ঞানে না হলেও অজ্ঞানে, তাদের প্রণীত চলতি নীতিগুলি বোধ কিংবা, চেতনার সমস্যায় জর্জরিত ভণ্ডনীতি বা, নিদেন ব্যর্থনীতি হবে তাতে সন্দেহ কী!

আরও বুঝতে হবে যে, দারিদ্রের সমস্যাটি বহু বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। এই সমস্যাকে একটিই বিপুল সমস্যা ধরে নিয়ে কয়েকটি অভিন্ন নীতির ভিত্তিতে সারা পৃথিবীতে কিংবা, সারা দেশে তার সমাধান করতে চাইলে সাফল্য মিলবে না। অভিজিত এবং তাঁর সহযোগীরা অতীত ও বর্তমানে

গৃহীত অজস্র নীতি এবং দারিদ্র দূরীকরণে সেগুলির ব্যর্থতা উল্লেখ করেছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে, অভিজিত বলছেন, দারিদ্রের বৃহৎ সমস্যাটির মধ্যে দারিদ্র-প্রকাশক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ক্ষুদ্রতর একাধিক সমস্যাকে চিহ্নিত করতে হবে। এই সমস্যার প্রতিটিকে আলাদা করে বোঝা এবং প্রতিটির আলাদা সমাধান নির্ণয় করা একান্ত প্রয়োজন। প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে প্রমাণ প্রয়োজন যে, ঠিক কোন নীতি সমস্যাটি সমাধানে সক্ষম। তাঁদের দাবী, আর-সি-টি অর্থাৎ, অক্রম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা পদ্ধতি এক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। নীতি প্রণয়ন এবং সেগুলির প্রয়োগও ক্ষেত্রভিত্তিক সমীক্ষা ও তার ফলাফলের ভিত্তিতেই হওয়া প্রয়োজন।

অভিজিত প্রমুখের অক্রম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা-সম্বলিত গবেষণার এবং সেগুলির ভিত্তিতে নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য যা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থশাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন –

ক) আর-সি-টি ভিত্তিক প্রতিটি পরীক্ষা সময়সাপেক্ষ। ফলে, ধৈর্যের প্রয়োজন;

খ) প্রতিটি পরীক্ষাই ব্যয়বহুল। ফলে, সরকারি কিংবা বেসরকারি অর্থানুকূল্যের প্রয়োজন;

গ) এই ধরণের গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গি কিংবা, আধারটি মাইক্রো-ইকনমিক অর্থাৎ, ব্যষ্টিগত অর্থনৈতিক তত্ত্ব-নির্ভর;

ঘ) অক্রম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা মূলত রাশিবিজ্ঞান-নির্ভর একটি পদ্ধতি;

ঙ) পদ্ধতিটি ব্যবহারিক অর্থনৈতিক তত্ত্ব-নির্ভর;

চ) পদ্ধতিটির বিবিধ অনুমানের একটি হল আর্থিক উন্নয়নের এক পর্যায় থেকে উচ্চতর পর্যায়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কিংবা, জীবনযাপনের নতুন কোনও পন্থা অবলম্বনের ক্ষেত্রে গরিব মানুষদের মধ্যে একধরণের জাড্য কাজ করে। তারা নিজেদের জীবনযাপনের ধরণ সহসা বদলাতে চায় না। সম্ভবত, তাদের বিশ্বাস হয় না যে, তাদের জীবনে কিছু বদলাবে;

ছ) আরও একটি অনুমান হল, গরিব মানুষ দারিদ্রের কারণেই অনেক সময় ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে;

জ) দরিদ্রকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করতে, জীবনযাপনের পদ্ধতি বদলাতে, প্রয়োজনে incentive অর্থাৎ, উৎসাহবর্ধক প্রয়োজক (যেমন, আমাদের উদাহরণে টিকার সঙ্গে ডাল বিলি) ব্যবহারের নিদান আছে যাকে কেউ কেউ বলছেন উৎকোচ;

ঝ) উপরোক্ত কারণেই, প্রয়োজনে nudge অর্থাৎ, মৃদু সচেতক ব্যবহার করা যেতে পারে। এই মৃদু সচেতক হতে পারে কোনও প্রচারের রূপে যেমন, সম্পত্তির ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার-বিষয়ক প্রচার। হতে পারে কোনও সরকারি ঘোষণার রূপে যেমন, নারী উদ্যোগীরা সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহণ করলে তাদের ক্ষেত্রে সুদের হার তুলনায় কম ধার্য করা হবে। হতে পারে কৃষিক্ষেত্রে

সার ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্থায়ী বা, দীর্ঘমেয়াদী ভর্তুকির বদলে সাময়িক ভর্তুকি যাতে কৃষকেরা সার ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিতে গড়িমসি না করেন, সীমিত সময়ের সুযোগ গ্রহণ করতে দ্রুত এগিয়ে আসেন।

অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সহযোগীরা অক্রম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবহার করে একাধিক আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গবেষণা করেছেন। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেগুলির অন্যতম। শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁদের পর্যবেক্ষণগুলির মধ্যে কয়েকটি হল – ক) শিক্ষার্থীরা নিয়মিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও তাদের শিক্ষার উন্নতি হয় না; খ) শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত বাড়ানো প্রয়োজন; গ) উক্ত অনুপাত বাড়লেও অনেক সময় তা ফলপ্রদ হয় না; ঘ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থায়ী সরকারি শিক্ষকদের হাজিরা নিয়মিত নয়, তাঁরা কামাই করেন বড্ড বেশি অর্থাৎ, ফাঁকিবাজ; ঙ) চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত অস্থায়ী শিক্ষকদের হাজিরা তুলনায় নিয়মিত; চ) যেসব প্রতিষ্ঠানে চুক্তি-ভিত্তিক অস্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা বেশি সেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের ফলাফল তুলনায় ভাল; ছ) যেসব প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী সরকারি শিক্ষকের সংখ্যা বেশি সেখানে শিক্ষার্থীদের ফলাফল বেশ খারাপ; জ) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে স্থায়ী সরকারি শিক্ষকের সংখ্যা কমিয়ে চুক্তি-ভিত্তিক অস্থায়ী শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন; ঝ) শিক্ষার্থীদের ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষককে পুরস্কৃত করা উচিত।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রেও অনুরূপ পর্যবেক্ষণ পাওয়া যায়। অর্থাৎ, ডাক্তার, নার্স, আয়া বা, অন্যান্য পরিচারকেরা স্থায়ী সরকারি কর্মী হলে কর্মে তাঁদের বাঞ্ছিত মনোযোগ দেখা যায় না। অন্যদিকে, অন্তত নার্স, আয়া বা, পরিচারকেরা চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী হলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির সেবা ও পরিষেবায় প্রভূত উন্নতি ঘটে। স্বাস্থ্য-বিষয়ক কর্মসূচীগুলি অনেক বেশি সফল হয়। হাতুড়ে ডাক্তাররা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে কিছু চিকিৎসাক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য সফলতা লক্ষ করা যায়। গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে ডিগ্রিপ্রাপ্ত ডাক্তার অলভ্য হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হাতুড়েদের চুক্তি-ভিত্তিক অস্থায়ী পদ্ধতিতে নিয়োগ করা যেতে পারে এবং অন্তত সীমিত কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের ব্যবহার করা যেতে পারে। সুতরাং, হাতুড়ে ডাক্তার এবং শিক্ষিত আগ্রহী যুবকদের চিকিৎসার প্রশিক্ষণ দেওয়া সুলভ ও কার্যকরী প্রমাণ হতে পারে।

ম্যাসাচুসেট্‌স ইনস্টিটিউট অফ টেক্‌নোলজি-তে অভিজিত ও এস্‌থারের গবেষণাগারটির নাম ‘আবদুল লতিফ জামিল পভার্টি অ্যাকশন ল্যাবরেটরি’ বা, সংক্ষেপে J-PAL। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এর শাখা আছে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাইকেল ক্রেমারও এই গবেষণা সংস্থার সঙ্গে

যুক্ত। অভিজিত ও তাঁর সহযোগীরা বিভিন্ন দেশে অজস্র অক্রম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা (র‍্যান্ডমাইজ্ড কন্ট্রোল্ড ট্রায়াল) করেছেন। দারিদ্রসংক্রান্ত নীতিগ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সরকার এবং বিভিন্ন সংস্থা এই পদ্ধতি ব্যবহার করছেন এবং পদ্ধতিটির প্রশংসা করছেন। তাঁরা বলছেন যে, উন্নয়ন অর্থনীতির ক্ষেত্রে অতীতের সমস্ত গবেষণার তুলনায় এটি ভিন্ন এবং দারিদ্রের সমস্যাগুলির চিহ্নিতকরণে ও সমাধান সন্ধানে অধিকতর উপযোগী।

প্রসঙ্গত, অভিজিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এস্‌থার দুফ্‌লো দীর্ঘদিন ধরেই উচ্চপ্রশংসিত দুই গবেষক। এঁরা দুজনেই বহু পুরস্কারে ভূষিত। নোবেল প্রাইজ পাওয়ার আগেই, ২০১০ সালে এস্‌থার পান জন বেট্‌স ক্লার্ক পদক। ইতিহাস এবং সংখ্যাতত্ত্ব বলছে, জন বেট্‌স ক্লার্ক পদক-প্রাপ্ত প্রতি দুজন অর্থনীতিবিদের মধ্যে একজন নোবেল পুরস্কার পেয়ে থাকেন।

অভিজিত, এস্‌থার, ক্রেমার প্রমুখের গবেষণাপদ্ধতির সমালোচনাও বিস্তর হয়েছে এবং হয়ে চলেছে। এঁরা নোবেল পাওয়ার বছর খানেক আগেই, ২০১৮ সালে, উন্নয়ন অর্থনীতির পনেরো জন গবেষক ‘দ্য গার্ডিয়ান’ পত্রিকায় ‘Buzzwords and tortuous impact studies won't fix a broken aid system’ শিরোনামে একটি খোলা চিঠিতে এঁদের পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করেন। এই পনেরোজন গবেষকের মধ্যে তিন জন নিজেরাও অতীতে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত। জেমস হেকম্যান এই পুরস্কার পেয়েছেন ২০০০ সালে, জোসেফ স্টিগ্‌লিৎজ ২০০১ সালে এবং অ্যাঙ্গাস ডিটন নোবেল পেয়েছেন ২০১৫ সালে। এঁরা এবং অভিজিত প্রমুখের অন্যান্য সমালোচকেরা যা বলছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হল –

ক) অভিজিতদের পদ্ধতিটি মূলত মাইক্রো অর্থাৎ, ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণরীতি অনুসারী। এই পদ্ধতি ম্যাক্রো অর্থাৎ, সমষ্টিগত ও সার্বিক কাঠামোগত বিশ্লেষণী দিকটিকে অবহেলা করে। সমালোচকদের বক্তব্য, দারিদ্র এবং তার প্রকৃতি মূলত অনুন্নত দেশগুলির আর্থ-সামাজিক কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই বৈশিষ্ট্যগুলির অন্যতম হল আয়, সম্পদ, লিঙ্গ এবং জাতপাত-ভিত্তিক বৈষম্য। মূল কাঠামোগত পরিবর্তন না হলে এই বৈষম্য এবং দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব নয়। এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ আর-সি-টি পদ্ধতি-অনুসারী গবেষণাগুলিতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, দারিদ্র-সমস্যার আলোচনার ক্ষেত্রে অভিজিত প্রমুখেরা আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও সম্পর্কগুলির পরিবর্তনের বৃহত্তর প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যান;

খ) এই গবেষণাগুলি মূলত স্বল্পকালীন লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত। অথচ, দারিদ্রের সমস্যার শিকড় প্রোথিত দীর্ঘকালীন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে। সময়ের পথে দারিদ্রের

যে সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর এবং জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে তাকে স্বল্পকালীন intervention বা, হস্তক্ষেপের দ্বারা সমাধান করা সম্ভব নয়। কারণ, নীতি প্রণয়ন এবং তাকে কার্যকর করার দায়িত্বপ্রাপ্তদের চরিত্র এবং সমাজের বাকি অংশ বিশেষত, দরিদ্রদের সঙ্গে তাদের আপেক্ষিক সম্পর্কে কোনও পরিবর্তন হয়নি। স্বল্পকালীন লক্ষ্যে গৃহীত নীতিগুলি আপাতদৃষ্টিতে এবং বিচ্ছিন্নভাবে সফল মনে হতে পারে, কিন্তু দীর্ঘকালে এই সমস্ত নীতি ও প্রয়াস দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে কতটা সফল হবে সে-বিষয়ে সন্দেহ থেকে যায়। সেক্ষেত্রে, ভবিষ্যতে দারিদ্রের সমস্যা আরও প্রকট ও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে;

গ) সমালোচকেরা বলছেন যে, আর-সি-টি পদ্ধতি অবলম্বনে পরীক্ষাগুলি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তাঁরা যুক্তি দর্শাচ্ছেন যে, (১) এই পদ্ধতি যদি দারিদ্রের দীর্ঘকালীন সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হয় তবে সমস্তটাই অপ্রয়োজনীয় অপব্যয়ে পর্যবসিত হয়; (২) অনুন্নত দরিদ্র দেশগুলির সরকার এই ব্যয়বহনে অক্ষম। সেক্ষেত্রে, এই ব্যয় কে বহন করছে বা, করবে? বেসরকারি বড় বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি কি? সমালোচকেরা বলছেন, তারা কোন্ স্বার্থে এই কাজে এগিয়ে আসছে বা, আসবে তা অনুসন্ধান করা উচিত;

ঘ) অভিজিত প্রমুখেরা তাঁদের গবেষণাগারকে ল্যাবরেটরি বলছেন ভাল কথা, কিন্তু পদার্থ, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের অনুকরণে মানুষকে কি জড় পদার্থ কিংবা, মনুষ্যেতর গিনিপিগের সমতুল বিবেচনা করা যায়? তা করতে চাইলে, সেই উদ্যোগ কি নৈতিক শর্তাবলী ও সীমারেখা লঙ্ঘন করে না? অভিজিতদের অক্রম নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষায় সামিল মানুষেরা যে স্বেচ্ছায় এই পরীক্ষায় সামিল হচ্ছেন তার প্রমাণ কী? শুধুমাত্র তাঁদের দস্তখত সম্বলিত নথি প্রদর্শনে কিছু প্রমাণ হয় না। incentive অর্থাৎ, উৎসাহবর্ধক প্রয়োজক যদি ঘুষ বা উৎকোচের কাজ করে তবে মানুষগুলির প্রকৃত সমস্যা ও তাঁদের মনোগত ইচ্ছা গবেষণাক্ষেত্রে তাঁদের আচরণে প্রকাশিত হয় না;

ঙ) আর-সি-টি একটি রাশিবৈজ্ঞানিক তথা গাণিতিক পদ্ধতি। গবেষকের পূর্বানুমান এই ধরণের যে-কোনও পদ্ধতির পরিকল্পনা ও প্রয়োগকে অনিবার্যভাবে প্রভাবিত করে। যেহেতু অর্থনীতির গবেষণায় সামিল পর্যবেক্ষণাধীনরা জড় পদার্থ বা, মনুষ্যেতর নন, তাঁরা গবেষকের পরিকল্পনায় প্রভাবিত হতে পারেন, গবেষককে প্রভাবিত করতে পারেন এবং পরিকল্পনার স্বল্পমেয়াদী সুযোগ সন্ধান করতে পারেন। এই কারণে তাঁদের ব্যক্ত প্রতিক্রিয়া এবং অব্যক্ত মনোভাব পরস্পরবিরোধী

হওয়ার ষোল আনা সম্ভাবনা। সুতরাং, পরীক্ষান্তে গবেষকের উদ্দিষ্ট ফলাফল প্রদর্শিত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত, যদিও সে ফলাফলে বাস্তব প্রতিফলিত হয় না;

চ) পদ্ধতি যদি পূর্বানুমান-নির্ভরই হয়, সেক্ষেত্রে অভিজিতদের সমর্থিত পদ্ধতিতে দারিদ্রের কারণ অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধানে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নীতি প্রণয়ন করবেন সরকার, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা, অ-সরকারি সংস্থাসমূহ, ঘোষিত লোকহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ও তাঁদের সংগঠন অর্থাৎ, বিশ্বের মধ্য ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ, দারিদ্ররেখার অনেক উপরে বসে পা দোলানো মানুষেরা। সেক্ষেত্রে, দরিদ্রকে বোঝা এবং দারিদ্রের সমস্যাকে বোঝার বিষয়ে অভিজিতদের বক্তব্য খুব বিশ্বাসযোগ্য না-ও হতে পারে এবং বক্তব্যের যুক্তিও হতে পারে অসার;

ছ) যদিও অভিজিতদের গবেষণা ব্যষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিপ্রসূত, যদিও তাঁরা স্থান ও কালভিত্তিক পরীক্ষায় বিশ্বাসী, তবুও তাঁদের বক্তব্যে এই দাবী প্রকাশ পায় যে, তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল স্থান ও কাল নির্বিশেষে প্রযোজ্য। এর কারণ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য নয়। মাইক্রো থেকে মাইক্রোতর বিভাজনের সীমানা অনন্ত। এই অনন্তের পথে অভিযান কোনও দেশের পক্ষেই অন্তত স্বল্পকালে সম্ভব নয়। দীর্ঘকালেও সমষ্টির তরফে এই ধৈর্যের প্রত্যাশা অবান্তর। পক্ষান্তরে, স্বল্পকালীন ও বিচ্ছিন্ন পরীক্ষাতত্ত্বের গুণগত স্থায়িত্ব ও মর্যাদা রক্ষার্থে তার এক কালে প্রায় সর্বত্র এবং দীর্ঘকালেও সাফল্যের নজির হাজির করা প্রয়োজন। গবেষণার থিওরেটিক্যাল এলিগ্যান্স অর্থাৎ, তাত্ত্বিক সৌষ্ঠব ও জমকের প্রকাশ প্রয়োজন এবং এই প্রকাশ চিরায়ত গণ্য হওয়া জরুরি। সুতরাং, অভিজিত প্রমুখের গবেষণাপ্রসূত ফলাফলের তাত্ত্বিক উত্তরণ এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রের সাধারণীকরণ আবশ্যিক। সুতরাং, ব্যষ্টিগত ক্ষেত্র-নির্ভর সীমায়িত লক্ষ্যের গবেষণার ফলাফলও তাঁরা সাধারণীকরণ করতে চাইছেন। অর্থাৎ, তাঁরা দাবী করছেন যে, ব্যষ্টিগত চরিত্র সমষ্টিগত চরিত্রের প্রভাবাধীন নয়। সেক্ষেত্রে, ব্যষ্টির যোগফলই সমষ্টি। এই উপসংহার ঐতিহাসিক বাস্তব ও তাত্ত্বিক বিচারে ভ্রান্ত;

জ) অভিজিত প্রমুখেরা ধরে নিয়েছেন যে, দরিদ্রের জীবনে intervention বা, নাক-গলানোর বিষয়টি সরল ও সমস্যারহিত। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাধারণভাবে নৈতিক ও আইনি কোনও প্রতিবন্ধকতা কিংবা, প্রতিবাদ নেই। একনায়কতন্ত্র কিংবা, স্বেচ্ছাচারী প্রশাসন বিনা এই পরিসর কোথায় মেলে? অভিজিত এক সাক্ষাৎকারে বলেওছেন, দারিদ্র দূরীকরণে গণতন্ত্র সবসময় নির্ভরযোগ্য নয়। সমালোচকদের প্রশ্ন, অভিজিত ঠিক কোন ধরণের

শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর পক্ষপাতী? তাঁরা অনেকেই অভিজিত প্রমুখের প্রবণতাকে ‘অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ’ নামে অভিহিত করছেন। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ এক কথায় বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তবু, সংক্ষেপে এটুকু বলা যেতে পারে যে, আজ অর্থনীতি আরও বহু সমাজবিজ্ঞানের এলাকাভুক্ত বিষয়ে গবেষণালব্ধ বক্তব্য রাখছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির পাশে ধ্রুপদী সমাজবিজ্ঞানের মতবাদগুলিকে ম্লান দেখাচ্ছে। অর্থনীতি আজ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদির এলাকাভুক্ত বিষয়ে প্রবেশ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, দার্শনিক ও ইতিহাসবিদের ভাবনাকে প্রভাবিত করছে তো বটেই, উপরন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়কে অর্থনীতি-চালিত প্রমাণ করছে। অর্থাৎ, বৃহত্তর সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা ও পঠনপাঠনের ক্ষেত্রে অর্থনীতি নেতা তথা প্রশাসকের ভূমিকা নিতে উদ্যত। এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কার্যক্ষেত্রে দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতির বক্তব্যকে পরিহাস কিংবা, উপেক্ষাও করতে পারে। অভিজিত প্রমুখের গবেষণায় না কি এই উপেক্ষা লক্ষণীয়;

ঝ) আর-সি-টি ভিত্তিক গবেষণাগুলির ফলাফল পরোক্ষে বেসরকারিকরণ, বাজার অর্থনীতি এবং কর্পোরেট সংস্থাগুলির প্রসারণের পক্ষেই যায়। এর ফলে দারিদ্রের সমস্যা সমাধান ও বেসরকারি কর্পোরেটের অগ্রগতি হয়ে দাঁড়ায় সদর্থক সম্পর্কিত। এই দুইয়ের মধ্যে এযাবৎ পরিলক্ষিত দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের কোনও উল্লেখই অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গবেষণায় মেলে না;

ঞ) অভিজিত প্রমুখেরা চলতি বাজার অর্থনীতির বিরুদ্ধে প্রশ্ন না তুলে, বরং এই অর্থনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দারিদ্র-সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেয়েছেন। অথচ, বাজার অর্থনীতি দারিদ্র-সমস্যার সমাধান দিতে অক্ষম। বাজার অর্থনীতি ভারসাম্যের কথা বলে। সেই ভারসাম্যে দাম ও দরের ওঠাপড়ার অমোঘ নিয়মে দারিদ্রের সংজ্ঞা পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে, দারিদ্র বিষয়ে অভিজিত প্রমুখের অজস্র বক্তব্যের শেষে প্রশ্ন থেকেই যায় যে, তাঁরা কাদের কোন্ সংজ্ঞায় দরিদ্র মনে করেন;

ট) সমালোচকদের মতে, অভিজিতের আর-সি-টি পরীক্ষায় সবটাই উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া। পরীক্ষার পরিকল্পনা থেকে তার ফলাফল গ্রহণ ও নীতি প্রণয়ন অবধি। একদা পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ-প্রশংসিত পঞ্চায়েতিরাজ তথা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার অস্তিত্ব অভিজিত প্রমুখের সাম্প্রতিক পরীক্ষায় অপ্রয়োজনীয় প্রমাণিত হয়। কারণ, অভিজিত প্রমুখের ধারণায় ও পরীক্ষায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হয় পরিবর্তন-বিমুখ কিংবা, স্থবির পিতৃতান্ত্রিক ধারণার বশীভূত। সেক্ষেত্রে, গ্রামীণ

আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় বাইরে থেকে ধাক্কা দেওয়া জরুরি। স্পষ্টতই, এই ধারণা ও ধারণা-ভিত্তিক নীতি দরিদ্র মানুষের চেতনা ও বিবেচনার ক্ষমতার বিষয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলে। অভিজিত যদিও বলছেন আচরণ এবং ব্যবহারিক বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের বিচারে একজন গরিব মানুষ এবং আর পাঁচজন মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের মানুষ হিসাবে দারিদ্র ব্যতীত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আর কোনও প্রভেদ নেই, তবুও শেষপর্যন্ত তাঁর গবেষণাপদ্ধতির মধ্যে সেই সন্দেহ বারংবার প্রকাশ পায়;

ঠ) অভিজিতদের আর-সি-টি ভিত্তিক গবেষণার ফল মেনে নিলে বলতে হয় যে, চলতি অর্থনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কাঠামোয় কোনও পরিবর্তন না ঘটিয়েই দারিদ্র দূরীকরণ সম্ভব। এই অভিমত ও উপসংহার যে জনপ্রিয় হবে এবং সরকারি প্রশাসন এবং বেসরকারি বাণিজ্যমহল উভয়ের কাছেই অত্যন্ত স্বাদু ও স্বাগত বিবেচিত হবে তাতে আশ্চর্য কী!

যা দেখা যাচ্ছে, অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সহযোগী গবেষকদের দারিদ্র-বিষয়ক গবেষণালব্ধ মতামতের পক্ষে যত, বিপক্ষেও ততই বক্তব্য রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ উচ্চপ্রশংসিত পুরস্কৃত জনপ্রিয় প্রভাবশালী যে-কোনও কর্মের ক্ষেত্রে এমনটাই স্বাভাবিক। বিশেষত, সমাজবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান-সম্পর্কিত ক্ষেত্রে, যে-ক্ষেত্রে কোনও বিষয়ে শেষ কথাটি বলে দেওয়া হয়েছে এমন দাবী কেউই করতে পারেন না।

ভারতে গত শতকের ষাটের দশকের মধ্যভাগে শুরু হয়েছিল ‘সবুজ বিপ্লব’, তৎকালীন অনেকেই যাকে যুগান্তকারী আখ্যা দিয়েছিলেন। ভারতে এই সবুজ বিপ্লবের জনক বলা হয় এম এস স্বামীনাথনকে। বোঝাই যাচ্ছে কতটা প্রশংসিত এবং পুরস্কৃত এই কৃষিবিজ্ঞানী। যার গবেষণা স্বামীনাথনকে অনুপ্রাণিত করেছিল তিনি হলেন আর এক কৃষিবিজ্ঞানী নরম্যান বোর্ল্যাগ্। তিনিও উচ্চপ্রশংসিত এবং বহু পুরস্কারে ভূষিত এমনকী, নোবেল পুরস্কারও তিনি পেয়েছেন। ১৯৭০ সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার পেলেও, সেই পুরস্কার ছিল কৃষি উৎপাদন ও খাদ্যের জোগান বিষয়ে তাঁর গবেষণার প্রতি স্বীকৃতি। সবুজ বিপ্লব কেন্দ্র করে প্রশংসা ও সমালোচনার ঝড় বয়ে গেছে, আজও চলছে। আজ অনেকেই ‘সবুজ বিপ্লব’ ব্যাপারটিকে ততটা মহান কিংবা, বৈপ্লবিক মনে করেন না। বরং, এই কৃষিনীতির কারণে একাধিক অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেছে বলে ভাবেন। উদাহরণস্বরূপ ভূগর্ভস্থ জলভাণ্ডার ও বর্ধিত আঞ্চলিক আয়বৈষম্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। অনেকেই বলছেন, ভারতে ভূগর্ভের জলস্তর কমে যাওয়ার অন্যতম কারণ সবুজ বিপ্লবের দান জনপ্রিয় উচ্চফলনশীল বীজের বহুল ব্যবহার কারণ এই বীজের ব্যবহারে অধিক পরিমাণে জলের

প্রয়োজন হয়। অনেকে এ-ও বলছেন যে, সবুজ বিপ্লবের কর্মসূচী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই সর্বত্র প্রযোজ্য ছিল না বলে আঞ্চলিক আয় বৈষম্য বাড়িয়ে তুলেছে। আরও বহু সমালোচনাই আজ উঠে আসছে সবুজ বিপ্লবের বিরুদ্ধে।

অভিজিত বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়, এস্থার দুফ্লো এবং মাইকেল ক্রেমার, অর্থনীতিতে এ-বছরের নোবেলজয়ী এই ত্রয়ীর কাজ প্রকৃতপক্ষে কত মহান এবং দারিদ্রের বিষয়ে তাঁদের মতামত কতটা গ্রহণযোগ্য তা সময়ই বলবে। আপাতত, বাঙালি হিসাবে বাঙালি অভিজিতের নোবেল জয়ে আমরা গর্বিত।